

বেগুন

বেগুন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় সবজি। সারা বছরই এর চাষ করা যায়। তবে শীত মৌসুমে ফলন বেশি হয়। এ দেশে বহু জাতের স্থানীয় বেগুন রয়েছে। তবে ফলনের দিক থেকে এদের কোনটিই তেমন উচ্চ ফলনশীল নয়।

স্থানীয় জাতের ব্যাপক জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়া, সংকরায়ণ ও জিন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৬টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।



বেগুনের ফসল

বেগুনের জাত



বারি বেগুন-১ এর ফসল

বারি বেগুন-১ (উত্তরা)

‘বারি বেগুন-১’ জাতটি ১৯৮৫ সালে উত্তরা নামে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের গাছ খাটো ও ছড়ানো। পাতা ও শাখার রং হালকা বেগুনী। ফল সরু ও লম্বা, ১৮-২০ সেমি তুক পাতলা, শাঁস নরম। চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। প্রতিটি গাছে ১০০-১৫০টি ফল ধরে। গাছে গুচ্ছাকারে ফল ধরে। উত্তরা জাত ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

এ জাতের গাছের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম হয়। জীবনকাল ১৩০-১৪০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৬০-৬৫ টন হয়। শীতকালে বাংলাদেশের সর্বত্র এ জাতের চাষ করা যায়। আগাম জাত হিসাবেও উত্তরা বেগুন চাষ করা যায়।

বারি বেগুন-২ (তারাপুরী)

‘বারি বেগুন-২’ একটি উচ্চ ফলনশীল সংকর জাত। ১৯৯২ সালে জাতটি তারাপুরী নামে অনুমোদিত হয়। ফল কালচে বেগুনী রঙের এবং বেলুনাকৃতির। ফলের তুক পাতলা, শাঁস নরম। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬৫-৭৫টি। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।

এ জাত উচ্চ ফলনশীল। জীবনকাল ১৩০-১৪০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৭০-৭৫ টন হয়। শীতকালে বাংলাদেশে সর্বত্র এ জাতের চাষ করা যায়।



বারি বেগুন-২ এর ফসল



বারি বেগুন-৪ এর ফসল

বারি বেগুন-৪ (কাজলা)

সংকরায়ণ ও পরবর্তী সময়ে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ‘বারি বেগুন-৪’ জাতটি ১৯৯৮ সালে ‘কাজলা’ নামে অনুমোদন করা হয়। উচ্চ ফলনশীল এ জাতের ফলের আকার মাঝারী লম্বা, রং কালচে বেগুনী ও চকচকে। কাজলা জাতের গাছের আকৃতি মাঝারী ছড়ানো। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৭০-৮০টি। প্রতি ফলের ওজন ৫৫-৬০ গ্রাম।

জাতটি ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। বীজ লাগানোর ৯০-৯৫ দিন পর ফল ধরে এবং ১৯০ দিন অর্থাৎ আশ্বিন-চৈত্র মাস (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-এপ্রিল) পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। কাজলা বেগুনের ফলন হেক্টরপ্রতি ৫৫-৬০ টন হয়।



বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা)

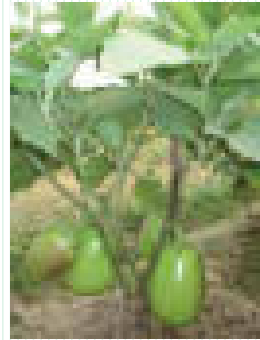
বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি বেগুন-৫' জাতটি ১৯৯৮ সালে 'নয়নতারা' নামে অনুমোদন করা হয়। এ জাত উচ্চ ফলনশীল।

এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফল গোলাকৃতি, রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩৫-৪০টি এবং প্রতিটি ফলের ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। এ জাতটি অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়।

আশ্বিন মাসে (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর) চারা রোপণ করলে চৈত্র মাস (মধ্য-মার্চ থেকে মধ্য-এপ্রিল) পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। নয়নতারা বেগুনের ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৫-৫০ টন। বেগুনের এ জাত ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা এবং ঢলে পড়া রোগে কিছুটা সহনশীল। এই জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (শীতকাল) মাসে এ জাত রোপণ করা হয়। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ১৪০-১৫০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর।



বারি বেগুন-৫ এর ফসল



বারি বেগুন-৬ এর ফসল

বারি বেগুন-৬

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির ঝোপালো। হালকা সবুজ রঙের ফল ডিম্বাকৃতির ও গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ১৫টি, লম্বায় ৮-৯ সেমি এবং ব্যাস ৭-৮ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ২২৫-২৫০ গ্রাম।

জাতটি সারা বছর চাষ করা যায় তবে শীতকালে এর ফলন বেশি হয়। এই জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। এ জাতের রোপণ সময় ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (শীতকালে) ও ফাল্গুন-বৈশাখ (গ্রীষ্মকালে)। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ১৫০-১৭০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর (শীতকালে), ২৫ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে)।

এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া রোগ, কৃমি রোগ এবং ফল-কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা ও জ্যাসিড পোকা সহনশীল।

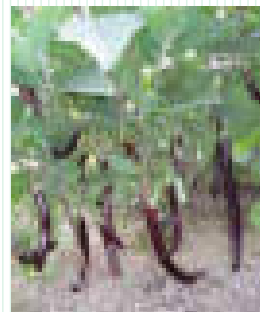
বারি বেগুন-৭

এ উচ্চ ফলনশীল জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফলের আকার লম্বা, চিকন এবং রং চকচকে গাঢ় বেগুনী। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি ও ফল লম্বায় ২০-২৫ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। সারা বছর চাষ করা যায় তবে শীতকাল এ জাতটির প্রকৃত মৌসুম। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়।

জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও সব এলাকায় চাষ করা যায়। এ জাতের রোপণ কাল ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (শীতকালে) ও ফাল্গুন-বৈশাখ (গ্রীষ্মকালে)। ফলন ৪০-৪৫ টন/হেক্টর (শীতকালে) ২৫ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে)।



বারি বেগুন-৭ এর ফসল



বারি বেগুন-৮ এর ফসল

বারি বেগুন-৮

উচ্চ ফলনশীল গ্রীষ্মকালীন এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফলের আকার লম্বাকৃতি, চিকন এবং রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ২০-২৫টি ও লম্বায় ১৮-২০ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ৭০-৮০ গ্রাম।

জাতটি সারা বছর চাষ করা যায়। দেশের সর্বত্র এটি চাষ করা যায়। ফলন ৩০-৩২ টন/হেক্টর। জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া ও কৃমি রোগ প্রতিরোধী।



সবজি ফল

বেগুন-৯

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির, ঝোপাল ও কিছুটা খাজকাটা পাতা বিশিষ্ট। ডিম্বাকৃতির ও উজ্জ্বল সবুজ রঙের। ফলের নিচের অংশে সাদা সাদা লম্বাটে দাগ থাকে। প্রতি গাছে গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি এবং ফলের গড় ওজন ৯০-১০০ গ্রাম। ফলন প্রতি হেক্টরে ৫০-৫৫ টন।

এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া, কৃমি ও শিকড় পচা রোগ সহনশীল।



বারি বেগুন-৯



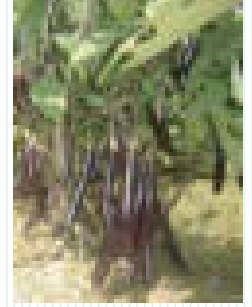
বারি বেগুন-১০

বারি বেগুন-১০

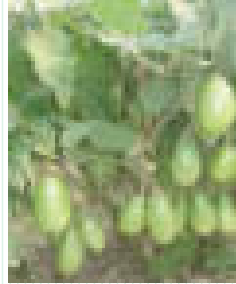
এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির ঝোপালো। ফলের রং উজ্জ্বল গাঢ় বেগুনী এবং লম্বা নলাকৃতির। তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। তবে শীতকালে ভাল ফলন হয়। প্রতি হেক্টরে ফলন ৫৫ টন। গ্রীষ্মকালে ফলন ২৫-৩০ টন।

বারি হাইব্রিড বেগুন-৩

‘বারি হাইব্রিড বেগুন-৩’ জাতটি বাংলাদেশে শীতকালে চাষাবাদের উপযোগী। এ জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির, ঝোপালো ও খাজকাটা পাতা বিশিষ্ট। বীজ বপনের ৮০-৯০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ১৪০-১৫০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফল লম্বাটে, নল আকৃতির ও গাঢ় বেগুনী রঙের। প্রতি গাছে গড় ফল সংখ্যা ৬০-৭০ এবং ফলের গড় ওজন ৯০-১১০ গ্রাম। গড় ফলন ৬৫-৭০ টন/হেক্টর। এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।



বারি হাইব্রিড বেগুন-৩



বারি হাইব্রিড বেগুন-৪

বারি হাইব্রিড বেগুন-৪

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির এবং ঝোপালো প্রকৃতির। ‘বারি হাইব্রিড বেগুন-৪’ বাংলাদেশে শীতকালে চাষাবাদ উপযোগী। ফল হালকা সবুজ ও ডিম্বাকৃতির। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ৩৫-৪০ এবং ফলের গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। গড় ফলন ৫৫-৬০ টন/হেক্টর। এ জাতের বেগুনের জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন এবং এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

বেগুনের উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু : আমাদের দেশের সব রকমের মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় এবং ভাল ফলনও দিয়ে থাকে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিই এর চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বেগুনের জন্য দীর্ঘ লম্বা সময়ব্যাপী নিম্ন তাপমাত্রা (১৫-২৫° সে.) সবচেয়ে উপযোগী। উচ্চ তাপমাত্রায় বেগুনের ফুল ও ফল উৎপাদন বিঘ্নিত হয় এবং এসময় অনিষ্টকারী পোকাকার আক্রমণ বেশি হয়। সে জন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে এর উৎপাদন তত ভাল হয় না। তাই শীতকালই বেগুন চাষের উপযুক্ত সময়। তবে কিছু উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণু জাত গ্রীষ্মকালে ভাল ফলন দিয়ে থাকে।

বীজের হার : অঙ্কুরোদগমের হার ৮০% বিবেচনায় বীজের পরিমাণ ২০০-২৫০ গ্রাম/হেক্টর

বীজ বাছাই : বেগুনের বীজ বপনের পূর্বে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন। ভাল ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে নির্দিষ্ট জাতের গুণাগুণ সম্পন্ন বেগুনের উচ্চ ফলন আশা পাওয়া যায় না। তাই অপুষ্ট, ভাঙ্গা ও অন্য শস্যের বীজ থাকলে তা বাছাই করা জরুরি।



মবজি ফসল

বীজ শোধন : বীজতলায় বপনের পূর্বে বেগুনের বীজকে রাসায়নিক ঔষধ (প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা ক্যাপটান) ব্যবহার করে ভালোভাবে ঝাকিয়ে বীজ শোধন করা। বীজ শোধনের ফলে বেগুনের এ্যানথ্রাকনোজ, লিফস্পট, ব্লাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রামণ রোধ সম্ভব হয়।

বীজতলা তৈরি ও পরিচর্যা :

- * দোআঁশ মাটি, বালি ও পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়।
- * বীজতলা সাধারণত এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। জমির অবস্থা ভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যেতে পারে।
- * বীজতলায় সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য ৪ সেমি দূরত্বে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- * চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন।
- * মূল জমিতে চারা লাগানোর পূর্বে বীজতলা থেকে তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজী হয়।
- * চারা লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও প্রখর রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন বা চাটাই দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলায় বীজ বপনের সময় : সেপ্টেম্বর (শীতকালে), মার্চ (গ্রীষ্মকালে)

চারার বয়স :

- * চারার বয়স ২৫-৩০ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।
- * বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ জন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। চারা রোপণ করার পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

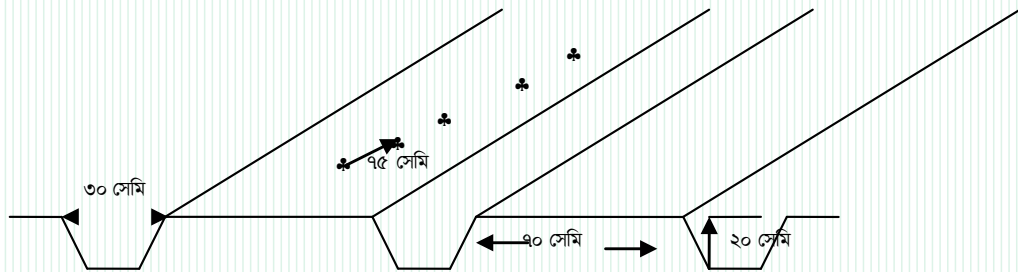
চারার সংখ্যা : চারার সংখ্যা অনেকাংশেই জমিতে রোপণ দূরত্বের উপর নির্ভর করে। রোপণ দূরত্ব ১০০×৭৫ সেমি হলে হেক্টর প্রতি ১৩,৩৩৩ টি চারার প্রয়োজন হয়।

চারা রোপণ দূরত্ব : রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাতের উপর। ছড়ানো জাতের জন্য বেশি দূরত্ব প্রয়োজন হয়, খাড়া জন্য কম দূরত্ব প্রয়োজন হয়। সাধারণত ৭০ সেমি প্রশস্ত বেডে এক সারিতে চারা রোপণ করা হয়। দুইটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকে। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৭৫ সেমি।

জমি তৈরি

জমির নকশা

বেডের আকার	প্রস্থ	: ৭০ সেমি
	দৈর্ঘ্য	: জমির দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করবে
নালার আকার	প্রস্থ	: ৩০ সেমি
	গভীরতা	: ২০ সেমি
সুতরাং	রোপণ দূরত্ব	: ১০০×৭৫ সেমি



জমি তৈরির নকশা

নবজি ফল

সারের মাত্রা

সার	পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	শেষ চাষের সময় (কেজি)	গর্তে প্রয়োগ (কেজি)	চারা লাগানোর ১৫ দিন পর	ফুল ধরা আরম্ভ হলে	ফল ধরা আরম্ভ হলে	ফল আহরণের সময়	ফল আহরণের সময়
গোবর/ কম্পোস্ট	১০,০০০	৫০০০	৫০০০	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০	-	-	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি
টিএসপি	২৫০	১২৫	১২৫	-	-	-	-	-
এমপি	২০০	-	৫০	৫০ কেজি	৫০ কেজি	৫০ কেজি	-	-
জিপসাম	১০০	সব	-	-	-	-	-	-
বোরিক এসিড (বোরন)	১০	সব	-	-	-	-	-	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

- * শেষ চাষের সময় অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং সবটুকু জিপসাম ও বোরিক এসিড সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- * বাকি অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং ৫০ কেজি এমপি সার চারা লাগানোর ৭দিন পূর্বে গর্তে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- * সম্পূর্ণ ইউরিয়া (৫টি কিস্তিতে) ও বাকি এমপি সার (প্রথম ৩টি কিস্তিতে) যথাক্রমে চারা লাগানো ১৫ দিন পর, ফুল ধরা আরম্ভ হলে, ফল ধরা আরম্ভ হলে, ফল আহরণের সময় ২ বার সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

খুঁটি দেওয়া ও পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করা : গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে। গাছে ১ম ফুলের ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা : জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগছামুক্ত রাখতে হবে। প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিলে মাটিত শিকড়ের বৃদ্ধি ভাল হয়।

সেচ : চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। বেগুন গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বেড়ের দুপাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। খরিফ মৌসুমে জমিতে পানি যাতে না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারপাশে নালা রাখতে হবে।

পোকা মাকড় : বিভিন্ন প্রকার পোকা ও মাকড় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেগুন উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে সাদামাছি, এফিড, থ্রিপস, পাতার হপার পোকা, কাঁটালে পোকা এবং মাকড় অন্যতম।

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা : কচি ডগা ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। বেগুনের বাঁটার নিচে ছোট ছিদ্র দেখা যায়। আক্রান্ত ফলের ভিতরটা ফাঁপা ও পোকাকার বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে।

পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল ধ্বংস করা : কীড়া সমেত আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করা।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার : সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার করে পোকাকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

পরজীবি ও পরভোজী পোকা ব্যবহার করা : ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার পরজীবি পোকা যেমনঃ *ট্রাখালা ফ্লেভো-অরবিটালিস* ও পরভোজী পোকা যেমনঃ ম্যানটিড, এয়ার-উইগ, পিপড়া, লেডি বার্ড বিটেল, মাকড়সা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেগুনের জমিতে এরা প্রচুর পরিমাণে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার কেবল ধ্বংস করে না সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকা যেমন- জ্যুসিড, সাদা মাছি ইত্যাদির সংখ্যা স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে সাহায্য করে।



মবজি ফসল

বিষাক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ বন্ধ বা সীমিত ব্যবহার : একান্ত প্রয়োজনে কেবলমাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক (ট্রেসার প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি) ব্যবহার করা যেতে পারে।

১। সাদা মাছি

- * বীজতলার চারা সূক্ষ্ম নেটের দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। এর ফলে চারাগুলি সাদামাছির আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে।
- * ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করে ফেলতে হবে এবং আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। নিম্ন বীজ ভিজানো পানি (প্রতি লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধ ভাঙ্গা নিম্ন বীজ ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে) প্রয়োগ করতে হবে।
- * আঠালো হলুদ ফাঁদ (Yellow Sticky Trap) ব্যবহার করতে হবে।
- * আক্রমণের শুরুতে বায়োনিম প্লাস (Azadiractin) @ ১মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- * আক্রমণের শুরুতে Polo 500 SC (Difenthrun)@ ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে অথবা আক্রমণের শুরুতে ইনটিপ্রিড ১০ এস সি (Chlorfenapyr) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

২। ত্রিপস

- * সঠিকভাবে সেচ প্রদান করতে হবে। কারণ, পোকাকার রস শোষণের ফলে ক্রমান্বয়ে গাছের কোষ থেকে পানি বের হয়ে পানি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেচ বা জমি ভিজিয়ে দিলে মাটিতে বিদ্যমান ত্রিপসের প্রিপিউপা ও পউপা মারা যায়।
- * মাঠে অসংগ্রহকৃত গাছ তুলে ফেলতে হবে এবং আগাছা দমন করতে হবে।
- * ফসলের ক্ষেতে সাদা আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
- * আক্রমণের শুরুতে সাকসেস ২.৫ এস সি (Spinosad) প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে অথবা আক্রমণের শুরুতে ইনটিপ্রিড ১০ এস সি (Chlorfenapyr) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

৩। জাব পোকা

- * সংগ্রহের পর ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করা।
- * আঠালো হলুদ ফাঁদ (Yellow Sticky Trap) ব্যবহার করতে হবে।
- * বায়োনিম প্লাস (Azadiractin)@ ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- * সুমিথিয়ন ৫০ ইসি বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা ফাসটাক ২ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি অথবা এসাটাফ ৭৫ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম বা এডমায়ার ২০০ এসএল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

৪। পাতার হপার পোকা

- * ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করা এবং আগাছা পরিষ্কার।
- * ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি (৫ গ্রাম/ লিটার) পাতার নিচের দিকে স্প্রে।
- * আক্রমণের শুরুতে বায়োনিম প্লাস (Azadiractin)@ ১মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- * আক্রমণের শুরুতে Polo ৫০০ SC (Difenthrun)@ ১মিলি/ লিটার অথবা ইনটিপ্রিড ১০ এস সি (Chlorfenapyr) প্রতি লিটার পানিতে ১মিলি মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।

৫। কাঁটালে পোকা

- * আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ডিমের গাদা, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণবয়স্ক পোকা হাত দ্বারা ধ্বংস করতে হবে।
- * ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।



নবজি ফসল

৬। লাল মাকড়

- * জমি, জমির আইল, সেচ নালা আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- * আক্রান্ত ফসলে উপরি সেচ প্রয়োগ করতে হবে। ধূলাবালি থাকলে এদের আক্রমণ বেড়ে যায়। ভারী বৃষ্টিপাতে মাইটের আক্রমণ কমে যায়।
- * মাকড় নাশক Abamectin (ভার্টিমেক ১.৮ ইসি অথবা Abom ১.৮ ইসি অথবা Ambush ১.৮ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি অথবা Propargite (Sumite or Omite ৫৭ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই

বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিম্নে প্রধান কয়েকটি রোগ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১। ডেম্পিং অফ

- * প্রতিষেধক হিসেবে মাটিতে ক্যাপটান, কপার অক্সিক্লোরাইড বা ডায়থেন এম-৪৫ ১-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভাল করে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপন করতে হবে।
- * বপনের পূর্বে প্রভাক্স, ভিটাভেক্স বা রিডোমিল গোল্ড (২.৫ গ্রাম/ কেজি বীজ) দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে।

২। কাণ্ড পচা ও ফল পচা (ফমপসিস)

- * সুস্থ-রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।
- * ফসল সংগ্রহের পর মুড়ি গাছ না রেখে সমস্ত গাছ, ডালপালা, পাতা ইত্যাদি একত্রে পুড়িয়ে ফেলা।
- * রোগ কাণ্ডে দেখা দিলে গাছের গোড়াসহ মাটি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ব্যাভিস্টিন বা নোইন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৩। ঢলে পড়া

- * আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা।
- * রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করা।
- * আক্রান্ত জমিতে শস্য পর্যায় (crop rotation) অনুসরণ করতে হবে।
- * পরিমাণমত সেচ দিতে হবে।

৪। গুচ্ছপাতা

- * আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা।
- * ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা।
- * ক্ষেতে পাতার হপার পোকের উপস্থিতি দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে তা দমন করা।

৫। স্কেরোটিনিয়া রট

- * সুস্থ বীজতলা হতে চারা সংগ্রহ করা।
- * আক্রান্ত গাছ মাটিসহ তুলে নষ্ট করা, গাছের পরিত্যক্ত অংশ ধ্বংস করা।
- * আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় রোভরাল (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) বা টিল্ট (প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি) বা ফলিকুর (প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি) স্প্রে করতে হবে।

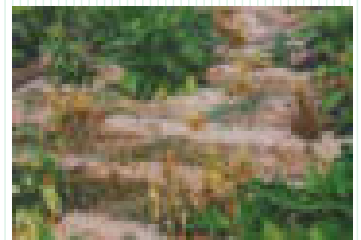
অন্যান্য পরিচর্যা

বেগুনের ঢলে পড়া রোগ

ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ হলে পাতা নেতিয়ে গাছ ঢলে পড়ে এবং মারা যায়।

প্রতিকার

- * রোগ প্রতিরোধক জাত লাগাতে হবে।
- * আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।
- * আক্রান্ত জমিতে শস্য পরিক্রমা অনুসরণ করতে হবে।



বেগুনের ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ

